পঞ্চম সংখ্যা

রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

পুজোর গাইড

সম্পাদকীয়

পুজো গাইড

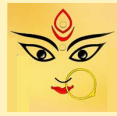

কাউন্টডাউন শুরু। প্রতিবছরের মতো এবারও মা দুর্গার আবাহনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বকর্মা পুজোয় আকাশে ঘুড়ি-সুতোর লড়াই মানেই মা আসতে আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, কোভিড পরিস্থিতি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ছন্দপতন ঘটিয়েছে। কোভিডের প্রথম, দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল অবস্থা সামলাতে না সামলাতেই দোরগোড়ায় অসুররূপী করোনার তৃতীয় ঢেউ এসে হাজির। বিশেষজ্ঞরা সতর্কবার্তা দিতে শুরু করেছেন। এতকিছুর মধ্যেও উৎসব প্রিয় বাঙালি মন কিন্তু মা আসার আনন্দে বিভোর। দুর্গতিনাশিনী মায়ের সন্তানরা নিশ্চিত দেবী দুর্গার আগমনেই সব রোগ, তাপ, শোক, ক্লেশ মিটে গিয়ে এই ধরিণী ফের হয়ে উঠবে নির্ভয়ে বসবাসের যোগ্য। তাঁর আশীর্বাদ হবে আমাদের চলার পথের পাথেয়। তবু সাবধান থাকা চাই। তাই উৎসবের আয়োজন করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা মনে রেখে প্রতি মুহূর্তে ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে কীভাবে সবদিক সামলে আনন্দমুখর হয়ে উঠবে সামনের ক'টা দিন। কারণ সবার আগে মানুষের জীবন। পুজো উদ্যোক্তারা কোভিড প্রোটোকল মেনেই পুজোর ব্যবস্থাপনায় লেগে রয়েছেন। পুজোর রেশ যেন পরতে-পরতে থাকে। আমরাও চেষ্টা করেছি পুজো আসার আগের সেই উত্তজনা বাড়িয়ে তুলতে। তাই এবারের এই সংখ্যা পুজোগাইড হিসেবেই প্রকাশ করা হচ্ছে। থাকছে কলকাতার সেরা সর্বজনীন পুজোর হদিশ, পুজোর সাজগোজ, কীভাবে পুজোয় বেড়াতে গিয়েও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, এমন আরো অনেক কিছুই। আশা করছি, পাঠকদের চাহিদা পূরণ করবে এই সংখ্যা।

সূচিপত্র

শুরুর পাতা	৩-৭
চেনা মানুষ অজানা কথা	৮-৯
কবিতা	১০-১১
বিশেষ রচনা	১২
পূণ্যভূমি	১৩
ভ্রমণ	১৪-১৫
আলোর দিশারী	১৬-১৭
পুজোর সাজ	১৮-১৯
বিনোদন	২০-২১

রূপকথা

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক

মানসকুমার ঠাকুর

নির্বাহী সম্পাদক

সৈকত হালদার

সম্পাদনা সহযোগী

রাই দাস

পরিচালনা

মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

অক্ষরবিন্যাস	প্রচ্ছদ
ইন্দ্রবুবলি	**কুন্তল**

কলকাতার সেরা সার্বজনীন পুজো

বাঙালিদের দুর্গাপুজো মানেই সর্বজনীন পুজো বা উৎসব। সবার কাছে বারোয়ারি নামে পরিচিত। এই বারোয়ারি শব্দটার উৎপত্তি বারো ও ইয়ার শব্দ দুটো থেকে। ১৭৯০ সালে হুগলির গুপ্তিপাড়ায় বারো জন ব্রাহ্মণ বন্ধু মিলে একটা সর্বজনীন পুজো করবেন বলে ঠিক করেন। প্রতিবেশীদের থেকে চাঁদা তুলে আয়োজন হয় ওই পুজোর। এভাবেই বাংলায় সর্বজনীন পুজোর শুরুয়াদ হয়। পরে তা লোকমুখে বারোয়ারি পুজো নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে দুর্গাপুজো শুধুমাত্র কলকাতার ধনী বাবুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বারোয়ারি পুজো চালু হওয়ার পর ব্যক্তি উদ্যোগে পুজোর সংখ্যা কমে যায় ও দুর্গাপুজো এক গণউৎসবে পরিণত হয়। মাঝে অনেক বছর পেরিয়ে দুর্গাপুজো আজ এক কার্নিভ্যাল।

উল্লেখযোগ্য সর্বজনীন পুজো

সবুজ সেন

সরকারি হিসাব অনুয়ায়ী, কলকাতায় ২০০০টির বেশি পুজো হয়। এর মধ্যে থেকে কিছু নামী পুজোর কথা জানানো হল যেগুলো অবশ্যই দেখতে হবে।

উত্তর কলকাতা

(১) দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিট পল্লি সমিতি
(২) পাথুরিয়াঘাটা ৫-র পল্লি
(৩) হাটখোলা গোঁসাইপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব
(৪) মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি সর্বজনীন পুজো
(৫) আহিরিটোলা বি কে পাল পার্ক সর্বজনীন দুর্গাপুজো
(৬) বাগবাজার সর্বজনীন
(৭) আহিরিটোলা শীতলাতলা সর্বজনীন পুজো
(৮) কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন
(৯) কুমোরটুলি সর্বজনীন দুর্গোৎসব
(১০) শোভাবাজার বেনিয়াটোলা সর্বজনীন পুজো
(১১) নিমতলা সর্বজনীন দুগোৎসব
(১২) হাতিবাগান নলিনী সরকার স্ট্রিট সর্বজনীন পুজো
(১৩) হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব
(১৪) হাতিবাগান নবীন পল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব
(১৫) গৌরীবাড়ি সর্বজনীন
(১৬) সিমলা ব্যায়াম সমিতি
(১৭) সিমলা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং
(১৮) লেকভিউ পার্ক সর্বনজনীন দুর্গোৎসব সমিতি
(১৯) সিঁথি সর্বজনীন পুজো
(২০) বাঙালি সংঘ

(২১) নবজীবন যুবক সংঘ
(২২) উত্তর বরানগর সর্বজনীন শ্রীশ্রীমাতৃপুজো সমিতি
(২৩) টালা বারোয়ারি

পূর্ব কলকাতা ও বিধাননগর

(১) তেলেঙ্গাবগান
(২) করবাগান
(৩) শুড়ির বাগান
(৪) উল্টোডাঙা বিধানসংঘ

(৫) মিতালি, কাঁকুড়গাছি
(৬) আবাসিকবৃন্দ কাঁকুড়গাছি
(৭) শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব
(৮) লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দ
(৯) নতুন পল্লি প্রদীপ সংঘ
(১০) আমরা সবাই, লেকটাউন
(১১) পাতিপুকুর রেলওয়ে কোয়ার্টার্স ও দিঘিরপাড় অধিবাসীবৃন্দ
(১২) লেকটাউন নেতাজী স্পোর্টিং
(১৩) জ'পুর ব্যায়াম সমিতি, কালিন্দী
(১৪) ১৪-র পল্লি সর্বজনীন, দমদম রোড
(১৫) তরুণ সংঘ, দমদম পার্ক
(১৬) দমদম পার্ক যুবক সংঘ
(১৭) লাবণী এস্টেট
(১৮) এফডি ব্লক, সল্টলেক
(১৯) এইচবি ব্লক, সল্টলেক
(২০) এজে ব্লক সর্বজনীন
(২১) আই এ ব্লক, সল্টলেক

মধ্য কলকাতা

(১) শিয়ালদহ রেলওয়ে অ্যাথলেটিক ক্লাব
(২) তালতলা যুব সংঘ
(৩) তালতলা সর্বজনীন শারদোৎসব কমিটি
(৪) এন্টালি উদয়ন সংঘ
(৫) সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
(৬) তালতলা ডাক্তার লেন
(৭) মহম্মদ আলি পার্ক
(৮) পার্কসাকার্স বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি
(৯) উদ্দীপনী
(১০) কলেজ স্কোয়ার সর্বজনীন
(১১) মধ্য কলকাতা সর্বজনীন দুর্গোৎসব
(১২) তালতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব
(১৩) সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার (নেবুতলা পার্ক)

বেহালা

(১) বেহালা ক্লাব
(২) দেবদারু ফটক

(৩) মুকুল সংঘ
(৪) বড়িশা ক্লাব
(৫) আর্দশ পল্লি
(৬) আচার্য প্রফুল্ল সংঘ
(৭) বড়িশা যুবক সংঘ
(৮) ঐক্য সম্মিলনী
(৯) বেহালা ২৯ পল্লি
(১০) সাহাপুর মিতালি সংঘ
(১১) সবেদা বাগান
(১২) বড়িশা তরুণ তীর্থ
(১৩) বেহালা প্রগতি সংঘ
(১৪) বড়িশা উদয়ন পল্লি
(১৫) বেহালা নূতন দল
(১৬) ঘোলসাহাপুর ইয়ংস্টার

দক্ষিণ কলকাতা

(১) সুরুচি সংঘ
(২) সন্তোষপুর লেকপল্লি
(৩) হরিদেবপুর অজেয় সংহতি
(৪) ৬৬ পল্লি
(৫) বাদামতলা আষাঢ় সংঘ
(৬) বাবুবাগান
(৭) অবসারিকা

(৮) ভবানীপুর মুক্তদল
(৯) পদ্মপুকুর বারোয়ারি সমিতি
(১০) বালিগঞ্জ সমাজসেবী সংঘ
(১১) ত্রিকোণ পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব
(১২) শিব মন্দির
(১৩) বোসপুকুর তালবাগান
(১৪) খিদিরপুর ২৫ পল্লি
(১৫) ৯৫ পল্লি কালীঘাট সংঘশ্রী
(১৬) ৬৪ পল্লি
(১৭) হরিদেবপুর বিবেকানন্দ

(১৮) হরিদেবপুর ৪১ পল্লি
(১৯) রাজডাঙা নব উদয় সংঘ
(২০) পল্লিমঙ্গল সমিতি
(২১) সেলিমপুর পল্লি
(২২) গড়িয়া মিতালি সংঘ
(২৩) একডালিয়া এভারগ্রিন
(২৪) নাকতলা ভ্রাতৃসংঘ
(২৫) নাকতলা উদয়ন সংঘ
(২৬) নাকতলা সম্মিলনী
(২৭) চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন
(২৮) মুদিয়ালি সংঘ
(২৯) বোসপুকুর শীতলা মন্দির
(৩০) ত্রিধারা সম্মিলনী

(৩১) যোধপুর পার্ক শারদীয় উৎসব কমিটি
(৩২) দেশপ্রিয় পার্ক সর্বজনীন
(৩৩) বালিগঞ্জ কালচারাল

(৩৪) সিংহী পার্ক
(৩৫) হিন্দুস্থান ক্লাব
(৩৬) বালিগঞ্জ পূর্বপল্লি
(৩৭) হিন্দুস্তান পার্ক
(৩৮) গড়িয়া বিধানপল্লি
(৩৯) আদি বালিগঞ্জ
(৪০) ভবানীপুর বকুল বাগান
(৪১) হরিদেবপুর আর্দশ সমিতি
(৪২) ম্যাডক্স স্কোয়ার
(৪৩) সোদপুর প্রগতি সংঘ

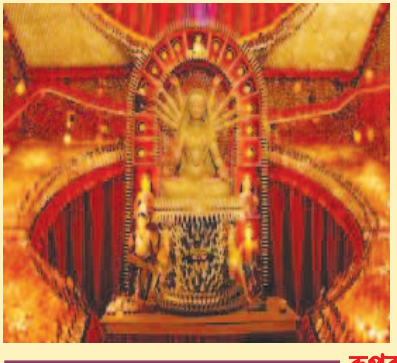

(৪৪) চেতলা অগ্রনী সংঘ
(৪৫) ভবানীপুর ২২ পল্লি
(৪৬) সূর্যনগর সর্বজনীন দুর্গাপুজো
(৪৭) পশ্চিম পুটিয়ারি পল্লি উন্নয়ন সমিতি

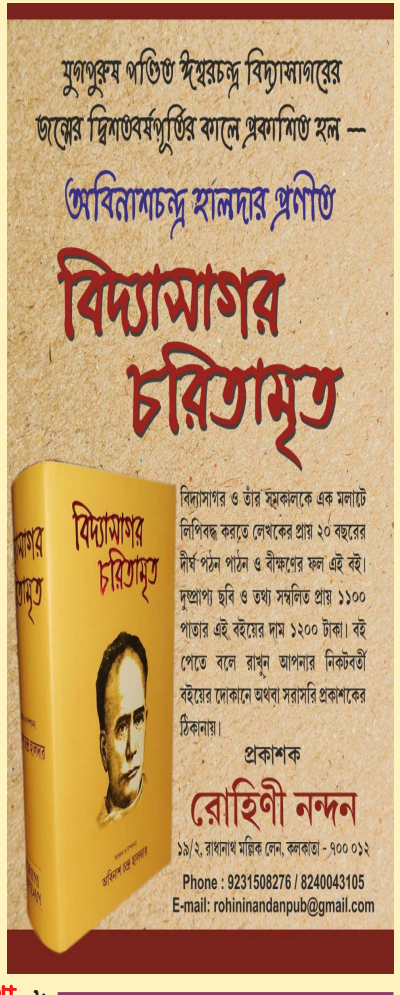

জেলার বিখ্যাত পুজো

কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেলাজুড়ে দুর্গা পুজো হয়। বেশিরভাগ পুজো বনেদি বাড়ির ও ওই পুজো ঘিরে রয়েছে নানা ঐতিহ্য ও কিংবদন্তির গল্প। আমার জেলাভিত্তিক তেমন কিছু পুজোর কথা জানাছি। যদিও তালিকাটা নানা জায়গার তথ্যের ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

হুগলির জেলার পুজো

(১) শ্রীরামপুর গোস্বামী বাড়ির পুজো
(২) শেওড়া ফুলি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বাড়ির পুজো
(৩) শেওড়াফুলি রাজবাড়ির ৩০০ বছরের পুজো
(৪) হংসেশ্বরী মন্দিরের পুজো
(৫) অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের পুজো
(৬) গুপ্তীপাড়া সেন বাড়ির পুজো

হাওড়া জেলার পুজো

(১) সালকিয়া দুর্গোৎসব বারোয়ারি পুজো
(২) বালি দেশবন্ধু ক্লাবের পুজো

জলাপাইগুড়ির জেলার পুজো

(১) ২৫০ বছরের রয়্যাল দুর্গা পুজো

ঝাড়গ্রামের পুজো

(১) কনক দুর্গা মন্দিরের পুজো
(২) বাওয়ালি রাজবাড়ির পুজো

বাঁকুড়া জেলার পুজো

(১) রাসমঞ্চের পুজো
(২) মৃন্ময়ী মন্দিরের পুজো (এই পুজো হয় বাঁকুড়ার শানবান্দা এলাকাতে। প্রতিমার সাজ এখানে সাবেকী। দুর্গা ও তাঁর ৪ ছেলে-মেয়েকে সাজানো হয় বেনারসীতে। পুজোর ভোগেও থাকে নানা বৈচিত্র্য। জেলার বনেদি বারির পুজোর স্বাদ নিতে আপনাকে আসতে হবে বাঁকুড়ার মুখোপাধ্যায় বাড়ির পুজো দেখতে।)
(৩) শ্যাম রাই মন্দিরের পুজো
(৪) মদনমোহম মন্দিরের পুজো

বীরভূম জেলার পুজো

(১) বানিওর রায়চৌধুরী বাড়ির পুজো
(২) প্রনব মুখার্জির বাড়ির ১০০ বছরের পুজো
(৩) আমোদপুরের ৪০০ বছরের পুজো

দিনাজপুর জেলার পুজো

দক্ষিণ দিনাজপুরের ১০৫ বছরের পুজো

মালদা জেলার পুজো

আদি কংশবণিক দুর্গা বাড়ির পুজো

মুর্শিদাবাদ জেলার পুজো

(১) ৪০০ বছরের প্রাচীন গদাইপুরের পেটকাটির পুজো। আখিরা নদী থেকে মাটি এনে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করেন গ্রামের মৃৎশিল্পীরা। শোনা যায়, এই জেলার জনৈক ক্ষুদিরাম রায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই দুর্গাপুজো গদাইপুর গ্রামে। এক দিন সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে এসে নিখোঁজ হন ওই পরিবারের একজন। পরে ছদ্মবেশ পেয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করা হয় দেবীদুর্গার পেট চিরে। সেই থেকে দেবীদুর্গা এখানে পেটকাটি দুর্গা নামে পরিচিত। প্রায় ৬০ বছর আগে এখানে পুজো শুরু হত বোধনের দিন থেকে। দেওয়া হত বলি। বিধান মেনে এখনো পুজো শুরু হয় বোধন থেকে। ২ বেলা ঢাক, ঢোল, সানাই বাজিয়ে ষষ্ঠীর দিন সকাল পর্যন্ত চলে বিশেষ পুজো।
(২) কল্যাণী মন্দিরের পুজো

দুর্গাকে মা ও মেয়ে রূপে কল্পনা করে মূর্তি গড়ি : চায়না পাল

২৬ বছর ধরে কুমোরটুলিতে মূর্তি গড়ছেন মহিলা মৃৎশিল্পী চায়না পাল। কাজের জন্য পেয়েছেন সরকারি স্বীকৃতি। দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে গিয়েছেন বিদেশেও। অতিমারির সঙ্কটকালেও দশভুজার মূর্তি গড়তে চূড়ান্ত ব্যস্ত। প্রবীণ এই মৃৎশিল্পীর সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতা।

প্রশ্ন : আপনিই কি বাংলার প্রথম মহিলা মৃৎশিল্পী ?

চায়না পাল : মৃৎশিল্পের পুরো ইতিহাস আমার জানা নেই। তাই সেটা বলতে পারব না। তবে বড়ো মাপের কাজ আমিই প্রথম শুরু করি।

প্রশ্ন : কবে থেকে কাজ শুরু করলেন ?

চায়না পাল : কুমোরটুলির মেয়ে বলে ছোটোবেলা থেকেই ঠাকুর গড়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। বাবা হেমন্তকুমার পাল ছিলেন নাম করা প্রতিমা শিল্পী। মা তাঁকে সাহায্য করতেন। বাবা কোনোদিন চাননি আমি এই কাজে আসি। ১৯৯৪ সালে বাবা আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার পড়ে আমার ওপর। বাবা বলেছিলেন, 'আগে ঠাকুরের সব কাজ নিখুঁতভাবে দেখবে। তারপর ঠাকুর গড়ার কথা ভাববে'। সেই ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পী হিসাবে জীবন শুরু করি। তখন থেকে টানা দু'দশকের বেশি সময় ধরে ঠাকুর গড়ছি।

প্রশ্ন : আপনার ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য কী ?

চায়না পাল : আমি থিম পুজো বা থিমের ঠাকুরে বিশ্বাসী নই। সাবেকি প্রতিমায় বিশ্বাস করি। এর জন্য একচালার ঠাকুর গড়ি। এক কাঠামোয় দুর্গার সঙ্গে থাকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের মূর্তি।

প্রশ্ন : আপনি দুর্গাকে কী চোখে দেখেন ?

চায়না পাল : দুর্গাকে আমি মা ও মেয়ে-এই দুটো রূপে কল্পনা করে মূর্তি গড়ি।

প্রশ্ন : ঠাকুর গড়ার উপাদান কোথা থেকে জোগাড় হয় ?

চায়না পাল : ঠাকুর গড়ার উপাদান নানা জায়গা থেকেই জোগাড় করতে হয়। যেমন, তারের মুখোশ আনা হয় কৃষ্ণনগর থেকে, শোলার সাজ আসে বর্ধমান ও কাটোয়া থেকে। আর আর্টের কাজ কুমোরটুলিতেই পাওয়া যায়। এঁটেল মাটি আসে

হাওড়ার উলুবেড়িয়া থেকে।

প্রশ্ন : কীভাবে মূর্তি গড়েন?

চায়না পাল : বরাত পাওয়ার পর প্রথমে কাঠামো তৈরি হয়। তারপর শরীরের নানা অংশ ও শেষে মায়ের মুখ বসানো হয়। মুখটা ছাঁচের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা পর্যায়ের কাজ নিজে তদারকি করি।

প্রশ্ন : শুধুই কি দুর্গার প্রতিমা গড়েন?

চায়না পাল : দুর্গা ছাড়া কালী, জগদ্ধাত্রী সব ধরনের মূর্তি গড়ি।

প্রশ্ন : আপনার ঠাকুর বিদেশে পাড়ি দিয়েছে?

চায়না পাল : ২০১৩ সালে আমার তৈরি প্রতিমা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল। ওই মূর্তি ছিল লম্বায় ৩ ফুট। সাধারণভাবে আমি ৬-১৬ ফুটের প্রতিমা গড়ি।

প্রশ্ন : কাজের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন?

চায়না পাল : ২০১৩ সালে প্রথম রাজ্যপালের কাছ থেকে মহিলা মৃৎশিল্পী হিসাবে এক ব্রোঞ্জের মূর্তি পুরস্কার পাই। ২০১৭ সালে এশিয়ান পেন্টস থেকে পুরস্কার পাই। ২০১৯ সালে মহিলা দিবসে মার্কিন দূতাবাস থেকে আমাকে সম্মান জানানো হয়।

প্রশ্ন : উল্লেখযোগ্য স্মৃতি কী আছে?

চায়না পাল : ২০১৮ সালে ভারত সরকার দেশের প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে চিনের কুইনিন শহরে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পাঠায়। দেড় থেকে ২ ফুটের মূর্তি তৈরি করে ওই দেশে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে মূর্তির কাজ শেষ করি। ভাষা বুঝতে পারব না বলে আমার সঙ্গে দোভাষীও পাঠানো হয়।

প্রশ্ন : মণ্ডপে গিয়ে নিজের গড়া ঠাকুর দেখতে কেমন লাগে?

চায়না পাল : মণ্ডপে নিজের গড়া ঠাকুর দেখতে গিয়ে অনেক খুঁত যেমন চোখে পড়ে ঠিক তেমনই অন্য ধরনের আনন্দও হয়। দর্শকদের ভালোলাগার সঙ্গে নিজের ভালোলাগা ভাগ করে নিতে চাই।

প্রশ্ন : কুমোরটুলিতে এখন আর মেয়েরা ঠাকুর গড়তে এগিয়ে আসছে না কেন?

চায়না পাল : কাজটা খুব পরিশ্রমের তাই ছেলেরাই ঠাকুর গড়ার কাজ করেন। তবে আমি চাই, মেয়েরাও এই কাজে এগিয়ে আসুক।

প্রশ্ন : আপনার স্টুডিয়োর নাম কী?

চায়না পাল : কুমোরটুলিতে আমার নিজের নামে স্টুডিয়ো রয়েছে (ঠিকানা-১ নং বনমালী সরকার স্ট্রিট)। পুজোর মরসুমে আমার সঙ্গে ২৫-৩০ জন লোক কাজ করেন। করোনার জন্য আমরা সব ধরনের সর্তকতা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই কাজ করছি।

ছায়া

সুপ্রীতি দত্ত

কখনো পায়ে,
কখনও সারা শরীরে জরায়।
যতো ঠেলি,
সে তত ঠেলে সজোরে।
সরাতে চায় দূরে,
তাও সরতে চায় না সে।
কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে,
লুকোচুরি খেলে।
একদিন পড়ন্ত রোদে,
চেয়ে দেখি আলতোভাবে,
ছুঁয়েছে ছায়াটি আমার,
মিশেছে আমারি সাথে।

অপেক্ষা

কমলাকান্ত মল্লিক

সব স্বপ্ন আঁকড়ে ধরিনি
আপেক্ষ থেকে যেতো,
সব স্বপ্নও সুখের হয়নি
অনুতাপও নেই ততো।
সব ঢেউ গুনতে যায়নি
খেই হারিয়ে যেতো,
সব ঝিনুকে মুক্ত খুঁজিনি
ক্লান্তি এসে যেতো।
সব ফুলের মালা গাঁথিনি
ঝরে পড়ে যেতো,
সব মালা গলায় পরিনি
হয়েছি পরাজিত।
সব পরাজয় মানতে পারিনি
হইনি ধৈর্যচ্যুত,
সব কিছুই পাইনি ঠিক
হয়নি মনের মতো।
সব প্রাণে ভালোবাসা খুঁজিনি
ঋণী থাকতে হতো,
সব পাথরে প্রাণ খুঁজিনি
তপস্যা বিফলে যেতো।
অনেক মিথ্যা উড়তে দেখেছি
উড়ুক তাদেরই মতো,
অনেক সত্য হয়নি প্রকাশ
শুধু অপেক্ষা সময়মতো।

রাই রাধা

তানিয়া

ওঠো গো রাই জলকে চলো
শ্যামের বাঁশি বাজে
বংশীধারীর হৃদয় যে আজ
বাঁধা তোমার কাছে
আলগা রেখো খোঁপার বাঁধন
নূপুর পরো পায়ে
কাজলা চোখের গোলকধাঁধায়
শ্যাম হারিয়ে যায়
বসে আছে শ্যাম প্রতীক্ষাতে
প্রাণযমুনার তীরে
রাই কিশোরীর মনে লাগে আজ
কম্পন ধীরে ধীরে
তুমি মম শ্যাম তুমি সুন্দর
একই দেহে তুমি
আধা নারী ও নর
সেই শ্যাম-রাই হলো যে
আজিকে অর্ধনারীশ্বর।

মাতৃ আশিস

মীরা দত্ত

যখন প্রথম ধরায় আমার,
আগমন তোমার কোলে।
মনে হয়েছিল এলাম যেন,
সুনিবিড় ছায়া তলে।
হাটি-হাটি পা পা মাগো
তোমারই পথ ধরে।
লিখতে শেখা অ-আ-ক-খ,
তোমার কাছে পড়ে।
কত বা বিনিদ্র রাত,
কাটিয়েছি আমাদের অসুখে।
কত না কষ্ট সহেছে সব,
ঘদন গত হয়েছে হাসি মুখে।
কেউ না জানুক আমি জানি,
সেই তো আমার মা।
বিশ্বের সেরা জননী আমার,
চিন্ময় রূপে আমার মা।

রহস্য গল্পের লেখক স্বপনকুমার

মধুমিতা দাস

আশির দশকে যাঁরা কিশোর ছিলেন আর যাঁদের গোয়েন্দা গল্প পড়ার নেশা ছিল তাঁরা সবাই স্বপনকুমার এই নামটির সঙ্গে পরিচিত। এই স্বপনকুমার আসলে কে? তাঁর আসল নাম ছিল সমরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে। আদিবাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী। জন্ম ১৯২৭ সালের ২৬ অক্টোবর। আর জি কর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তেন। টাকার অভাবে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে গোয়েন্দা গল্প লিখতে শুরু করলেন। হয়ে গেলেন স্বপনকুমার। গোয়েন্দা গল্পের পাশাপাশি শুরু হল তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে বই লেখা। স্বপনকুমার হয়ে উঠলেন জ্যোতিষী 'শ্রীভৃগু'। এরপর বাজারে এল প্রথম বাংলায় লেখা ডাক্তারি বই 'প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন', 'টেক্সট বুক অফ প্যাথোলজি', টেক্সট বুক অফ অ্যানাটমি' সহ আরো অনেক বই।

লেখক এস এন পাণ্ডে। অর্থাৎ সমরেন্দ্রনাথ ওরফে স্বপনকুমার। থাকতেন শ্যামবাজারে। অভাবী লেখক। কোথায় পাবেন বিনে পয়সায় আলো ও ফ্যানের হাওয়া। গোয়েন্দা গল্পের লেখক বলে কথা। উপায় বের করলেন। শিয়ালদহ স্টেশনে বসে সারা রাত ধরে লিখতেন। ২০০১ সালের ১৫ নভেম্বর ৭৩ বছর বয়সে বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীভৃগু, ওরফে স্বপনকুমার মারা যান।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি ধন্য শ্যামপুকুর বাটি

বিভিন্ন সময়ে কলকাতার নানা জায়গায় পরমপুরুষদের পদধূলি পড়েছিল। তেমনই কিছু বাড়ির খোঁজ দেওয়া হবে এই বিভাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বেশ অসুস্থ। গলার সমস্যা আরো বেড়েছে। সিঁথির কবিরাজ মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে তাঁর চিকিৎসা চলছে। একটু বিশ্রামের দরকার। দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হল শ্যামপুকুর। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাকার মহেন্দ্রগুপ্ত ও কালীপদ ঘোষ সব ব্যবস্থা করলেন। ১১ টাকায় ভাড়া নেওয়া হল গোবুংল ভট্টাচার্যের বৈঠকখানার বাড়ি। ১৯৮৫ সালের ২ অক্টোবর ঠাকুর এলেন। সঙ্গে মা সারদা, নরেন্দ্রনাথ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও কিছু ভক্ত।

সবার ব্যবস্থা হল দোতলার বড় ঘরে। মা সারদা থাকবেন তিনতলায়। মা সারদা ভোরবেলা স্নান করতে যেতেন বাগবাজারের ঘাটে। তারপর ঠাকুরের জন্য রান্না করতেন। কিন্তু তাঁকে কেউ কখনো দেখতে পেত না। শ্যামপুকুরে এক মাস থেকে তিনি চলে গেলেন। তখনও ঠাকুর সেখানে।

এদিকে কালীপুজোর সময় এসে গেল। সবাই মনমরা। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ছাড়া ভবতারিণীর পুজো কী করে হবে! ঠাকুর নিজেই সবাইকে আশ্বস্ত করলেন। শ্যামপুকুরেই শ্যামাপুজোর আয়োজন করতে বললেন। ঠাকুর আরো বলেন, 'হয়তো এখানেই শক্তির আবির্ভাব হবে'।

আদেশমতো পুজো হল। সন্ধ্যা আরতির সময় মাতৃমূর্তির একদিকে বসা ঠাকুরের দিকে চোখ গেল গিরিশ ঘোষের। দেখলেন, তাঁর চারটে হাত। ঠাকুরের অ্যাদারূপে বিস্মিত গিরিশ। সে রূপের সাক্ষী ছিলেন আরো অনেকে। তাঁরা পায়ে ফুল দিলেন। পুজোর জন্য পায়েস এসেছিল কালীপদ ঘোষের বাড়ি থেকে। ৬ লিটার দুধের পায়েস তৈরি করেন কৃষ্ণপ্রিয়াঙ্গিনী ঘোষ। পরমহংস পুরোটাই খান।

সেই থেকে আজও শ্যামাবাটির কালীপুজোয় ৬ লিটার দুধের পায়েস দেওয়ার নিয়ম চলছে। মোট ৭০ দিন শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে ছিলেন। তারপর ভক্ত সমাগম বাড়তে থাকে। ফলে জায়গা কুলিয়ে উঠছিল না। এজন্য ১১ ডিসেম্বর তাঁকে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্যামপুকুর বাটিতে একটা মিউজিয়াম করা হয়েছে। এখানে ঠাকুরের নানা জিনিসপত্র ও তাঁর একটা অরিজিন্যাল ছবি রয়েছে। অবিনাশচন্দ্র দাঁ যে ক্যামেরা ব্যবহার করেন তাও রাখা আছে। ঠাকুরের এখানে আসা উপলক্ষে প্রতিবছর ২ অক্টোবর কালীপুজোর বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কীভাবে যাবেন

বিধানসরণির টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে ঢুকে কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ।

ঠিকানা - ৫৫এ, শ্যামপুকুর বাটি, কলকাতা ৭০০০০৪।

স্বর্গের সদর দরজা

প্রশান্ত দাস

শিলিগুড়ি শহর থেকে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতে করতে ২ ঘণ্টার মধ্যে আপনি পৌঁছে যাবেন স্বর্গের সদর দরজায়। গাড়ি-ঘোড়ায় তো অনেকে ঘুরেছেন। শিলিগুড়ি এসে একটা বাইক ভাড়া নিয়ে এবারে বাইকে চলুন। সম্ভব হলে প্রিয়জনকে সঙ্গে নিন, দেখবেন জীবনের স্বাদ কাকে বলে।

দার্জিলিং জেলার এক অখ্যাত পাহাড়ি জনপদ অহলদাড়া। নির্জন প্রকৃতির মাঝে, কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে মিঠে রোদ পোয়ানোর নাম অহলদাড়া। ৫ হাজার ফুট উচ্চতায়, হিমেল হাওয়ায় গুটিসুটিমারা নির্জন স্নিগ্ধ সহজসরল জীবনযাত্রা। এখনো সেভাবে এই জায়গায় পর্যটকদের পা পড়েনি এমনটা আর বলা যাবে না। কারণ গত কয়েক বছর ধরে অনেকেই অহলদাড়ায় যাওয়া শুরু করেছেন। আঁকাবাঁকা, সরু পিচ রাস্তায় যে কোনো সময় হারিয়ে যাওয়ার হাতছানি। হাত বাড়ালেই পাইন আর সিঙ্কোনার সার বাঁধানো ঘন সবুজ পাহাড়। ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে সিটংয়ের বিখ্যাত কমলালেবু ও হর্ণবিল পাখির স্বর্গরাজ্য এই গ্রাম। পাহাড়ের প্রান্তে এসে দাঁড়ালে মনে হবে এই তো সেই স্বপ্নের প্রান্তিক স্টেশন। অহলদাড়ার হদিশ পেতে হলে শিলিগুড়ি থেকে সেবক রোড ধরে ছুটতে হবে। সেবক কালীমন্দির, করোনেশন ব্রিজ পার হয়ে কালীঝোড়া দিয়ে লাটপাঞ্চার হয়ে যাওয়া যায়। তবে করোনেশন ব্রিজ থেকে সিকিমের রাস্তায় ৭-৮ কিলোমিটার এগোলেই 'বিরিক' মোড় দিয়ে যান। এই রাস্তায় প্রকৃতি তার রূপের ডালি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে। রাস্তাও খুব ভালো। বিরিক মোড় থেকে বাঁ দিকের দেড়-২ হাজার ফুট খাড়া সরু রাস্তা। তারপর সমতল। ৪-৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর কমলালেবুর স্বর্গরাজ্য বিখ্যাত গ্রাম 'সিটং'। সিটংয়ের বিভিন্ন হোম স্টেতে গিয়ে ভীষণ মিষ্টি আতিথেয়তার পাশাপাশি পেয়েছি অসাধারণ সৌন্দর্য, যা মুগ্ধ করে রাখে। ওই জায়গা থেকে দেড় কিলোমিটার এগোলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট গ্রাম শেলপু বাজার। এই শেলপু হিলসেরই সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট অহলদাড়া। অহলদাড়ার ৫০০ মিটার নিচেই রয়েছে নামথিং লেক। অহলদাড়ায় পৌঁছোলেই আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে কনকনে হিমেল হাওয়া আর সোনাঝুরি

মিঠে রোদ। কাঞ্চনজঙ্ঘার অকল্পনীয় রূপ দেখতে পাবেন এই অহলদাড়া থেকে। কিন্তু দামাল মেঘেদের শাসন আপনাকে এই স্বর্গীয় অনুভূতি থেকে মাঝেমধ্যে বঞ্চিত করতে পারে। তাতে অবশ্য বিশেষ অসুবিধা হবে না। কারণ এই পাহাড়ি জনপদের অনন্য রূপে আপনি এমনিই মুগ্ধ হবেন। পাহাড়ের গায়ে লেপটে রয়েছে পদম গুরুঙ ও হর কারম চামলিংদের গোটা কয়েক সুদৃশ্য কটেজ আর চারদিকে পাইনঘেরা পাহাড়-পাহাড় আর পাহাড়। প্রতিনিয়ত শুনতে পাবেন সোঁ সোঁ-সাঁই সাঁই শব্দে বাতাসের তীক্ষ্ণ সুরেলা সুর। এই সব কটেজ প্রকৃতির সঙ্গে আপনার মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি হয়েছে।

পাইনের একচ্ছত্র অধিকার, গম্ভীর পাহাড়ের নিস্তব্ধতার সুবিশাল প্রাচীন সাম্রাজ্য আর হর্ণবিলসহ রঙবেরঙের বিভিন্ন নাম না জানা পাখিদের আপন দেশ এই অহলদাড়া। কটেজে বসে থাকতে পারবেন না। প্রতিনিয়ত আপনাকে হাতছানি দেবে সৌম্যসুন্দর কাঞ্চনজঙ্ঘা আর পাইনের মিছিল। সভ্যতার পোশাক খুলে ফেলে বুনো গন্ধ গায়ে মেখে পাহাড় আর গাছেদের সংসারে আপনি সহজেই মিশে যাবেন।

দুপুরের পর থেকেই ঘন নীল আকাশের দখল নিতে শুরু করবে দাপুটে দামাল মেঘের দল। শনশন হিমেল হাওয়া কাঁপন ধরিয়ে দেবে শরীরে। পাখিদের কিচিরমিচির, মেঘেদের মাথায় মুকুটের মত নিঝুম পাহাড়শ্রেণি, পাহাড়ের ধাপে ধাপে চাষ করা ফসলের সবুজ আলপনা আর পাইন সিক্কোনার জঙ্গলের আলো-আঁধারি পবিত্র সন্ধ্যা নামার তোড়জোড়ে এ যেন সত্যিই স্বর্গের সদর দরজা।

আলোর দিশারি

অঞ্জন দে

ছক ভেঙে মাইমের মান বাড়াতে উৎসাহী সোমা

নানান ধরনের কর্মসূচি ও ঐকান্তিক প্রয়াসে মূকাভিনয়কে আমজনতার দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে চলেছে সোমা মাইম থিয়েটার। এই কাজের জন্য দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি ও সম্মানও পেয়েছেন। এই সংখ্যায় সংস্থার পরিচালক সোমা দাসের সঙ্গে একান্ত আলাপন।

শব্দ ও সংলাপ ছাড়া ইশারা আর অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অভিনয় হল মূকাভিনয় বা মাইম। সাজ ও পোশাকের অনাড়ম্বর ধারা, সামান্য আলোর কারিগরিতে শিল্পীরা অসামান্য হয়ে ওঠেন। মূকাভিনয়ের এই ধারাকে যাঁরা উজ্জ্বলতার আলোয় এনে দাঁড় করিয়ে এক অন্য মাত্রা দিয়েছেন তাঁরা হলেন যোগেশ দত্ত, পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী ও কমল নস্করের মতো মাইম ব্যক্তিত্ব। তাঁদের দেখানো পথ ধরে মূকাভিনয়ে থিয়েটারের ধারণা এনে গতানুগতিক ছকের বাইরে বেরিয়ে কাজ করে চলেছেন সোমা মাইম থিয়েটারের পরিচালক সোমা দাস।

মাত্র ৫ বছর বয়স থেকে সোমা এই নির্বাক শিল্পের সঙ্গে জড়িত। প্রথম তালিম পান বাবা মানিকলাল মজুমদারের কাছে। পরে নিরঞ্জন গোস্বামীর কাছে তাঁর ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৯৩ সালে শিশু মূকাভিনেত্রী হিসাবে তৃপ্তি মিত্র স্কলারশিপ পান। পরবর্তী সময়ে যুব উৎসবে জেলা ও রাজ্যস্তরে একাধিকবার পুরস্কার পেয়েছেন। আন্তঃকলেজ নাটকের প্রতিযোগীতায় তিনি সেরা নাট্য পরিচালকের পুরস্কার পান। ২০২০ সালে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে সোমা জাতীয় পুরস্কার পান।

২০১৫ সালে নিজের নামে তৈরি করেন সোমা মাইম থিয়েটার। এরপর আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি। দেশের নানা রাজ্যে, এমনকী বাংলাদেশে একাধিকবার অনুষ্ঠান করেছেন। সোমা মাইম-এর দলগত উপস্থাপনার মধ্যে আছে সাঁকো, আমার জন্মভূমি, এবং প্রেম, অমৃতস্য পুত্র, উদ্যান, স্যালন, ওয়াইল্ডলাইফ, সেভ ওয়াটার সেভ লাইফ, সেফটি ইজ দ্য কি, আবাহনের পথে। সোমা দাসের একক উপস্থাপনার মধ্যে আছে জন্মের প্রথম শুভক্ষণ, ফিশার ইউমেন, লাইফ, আমার জন্য

কোনটা, ঢাকি, পোস্ট মাস্টার, কৃষ্ণকলি, ডে উইথআউট হাজব্যান্ড, স্বাধীনতা, শাস্ত্রী। তবে সোমা খুব খুশি হয়েছেন আমার জন্মভূমি, এবং প্রেম, সাঁকো, আবাহনের পথে, উড়ান, শহরের পান্তাবুড়ি, বেঁচে থাকার মন্ত্র ও পহেচন'য়ে কাজ করে। মাইমের প্রযোজনার পাশাপাশি দেশে ও বিদেশে মাইমের বিভিন্ন সেমিনার করেন। কাজের জন্য সোমা পেয়েছেন বিসমিল্লা খান যুব পুরস্কার, গৌরব ভোকেশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড।

সোমা মাইম থিয়েটার নিজেদের অনুষ্ঠান, কর্মশালার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের ইভেন্টও করে। যেমন সিনেমার মতো মাইম পোস্টার তৈরি করেছে। ২০১৭ সালে 'পাড়া পড়শির থিয়েটার' নামে এক উৎসব করে সাড়া ফেলে দেয়। এছাড়া প্রতিবার বছরের শেষে বিশ্ববঙ্গ মূকাভিনয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। সোমা মাইম থিয়েটার'য়ের পক্ষ থেকে মহালয়ার দিন 'আগমনী' উৎসবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতি মহিলাদের সম্মান জানানো হয়। ২০১৯ সাল থেকে এই ইভেন্ট চালু হয়ে মাইমের জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছে। অতিমারির জন্য যখন মঞ্চের অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল তখনও সোমা মাইম তাদের শিল্পচর্চা বজায় রাখে। ঠিক ওই সময়ে মূকাভিনয়ের শিল্পীদের মানসিক উৎসাহ বাড়াতে 'ওয়ার্ডস অফ সাইলেন্স' নামে এক বিশেষ অনুষ্ঠান করে।

মূকাভিনয়ের জন্য সোমা দাস আগরপাড়ায় এসএমটি এরিনা গড়ে তুলেছেন। এটা এক অন্তরঙ্গ থিয়েটার স্পেস। ২২০০ বর্গফুটের জায়গায় একসঙ্গে ৫০-৬০ জন দর্শক বসে মূকাভিনয় দেখতে পারেন। গতবছর থেকে এই প্রেক্ষাগৃহ চালু হয়েছে। মূকাভিনয়ের জন্য এধরনের অন্তরঙ্গ স্পেস রাজ্যে এটাই প্রথম। সোমা জানান, 'মূকাভিনয়ের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। তার বড় প্রমাণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূকাভিনয় উৎসব। যেখানে দর্শকদের ভিড় উপচে পড়ছে। নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসছে। মাইম প্রযোজনায় স্পনসর হিসাবে কর্পোরেট সংস্থাও এগিয়ে আসছে।'

মূকাভিনয় শিল্পী সোমার দাসের কাছে মাইম নিছক বিনোদন নয়। সামাজিক দায়বদ্ধতাও। সোমার কথায়, 'আমরা নানা প্রযোজনার মাধ্যমে দর্শকদের একটা বার্তা দিতে চাই। আমরা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করেছি। এছাড়াও নানা সামাজিক সংস্কার, নারী ও শিশু নির্যাতন নিয়ে অনুষ্ঠান করেছি।'

ওঁর প্রতিটা কাজের বিশেষত্ব 'ক্লাস'এর সঙ্গে 'মাস'-য়ের সমন্বয় ঘটানো। তাঁর কথায়, 'আমরা মাইমকে সিনেমার মতো জনপ্রিয় করতে চাই। ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। খুব তাড়াতাড়ি আমার লেখা মূকাভিনয়ে ভারতীয় মহিলাদের অবদান নিয়ে বই বেরোচ্ছে।'

বয়সের সঙ্গে মাননসই সাজ

পুজো মানে নতুন জামা, জুতো ও সেই সঙ্গে সাজগোজ। চড়া সাজ এখন অচল। পুজোর সময় কেমন সাজগোজ করবেন, পরামর্শ দিলেন বিশিষ্ট বিউটিশিয়ান শর্মিলা সিং ফ্লোরা।

এখন মেকআপের মূলমন্ত্র 'নো লুক মেকআপ'। মানে ভরপুর সাজবেন অথচ সেই সাজ বোঝা যাবে না। তবে সাজটা সব সময়ে হওয়া চাই বয়সমাফিক। টিনএজারের সাজের সঙ্গে ৩৫-৪০ বছরের কোনো মহিলার সাজের পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।

প্রথমে আসি টিনএজারদের সাজের কথা। পুজোর সময় কলকাতায় যথেষ্ট গরম থাকে। তাই পুজোর মেকআপ হওয়া চাই ওয়াটার বেসড। যে কোনো কসমেটিক্স শপ থেকে আগে থেকে ওই বেস কিনে রাখুন। তার ওপর লাগান ময়েশ্চারাইজার কমপ্যাক্ট। এর শেড বাছবেন গায়ের রং অনুযায়ী।

মেকআপের সময় চোখের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। তাতে মুখের সৌন্দর্য বাড়বে। দিনের বেলা মাসকারা হবে ট্রান্সপারেন্ট। আইশ্যাডোর রংটা কিন্তু পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে লাগাতে হবে। তার সঙ্গে চাই মানানসই হাইলাইটার।

সকালের দিকে পোশাকের রং হালকা হলেই ভালো। অরেঞ্জ শেডের আইশ্যাডো লাগালে সোনালি হাইলাইটার বাছবেন। রেড রঙের আইশ্যাডোর সঙ্গে বাছুন তামাটে হাইলাইটার। আর খয়েরি আইশ্যাডোর সঙ্গে লাগান ব্রোঞ্জ হাইলাইটার। হালকা করে টেনে সামান্য ঘষে দেবেন। ব্যস যথেষ্ট। তবে খেয়াল রাখবেন ঘষতে গিয়ে ধেবড়ে না যায়।

এবার আসি ব্লাশ-অন প্রসঙ্গে। ব্লাশ-অনের রংটা অবশ্যই আইশ্যাডোর সঙ্গে মিলিয়ে বাছবেন। সকালে একটু হালকা রঙ ভালো। যাদের মুখটা ভারী ধরনের আর গোল তারা ব্লাশ-অনটা টানবেন থুতনি থেকে কান পর্যন্ত। এতে মুখটা একটু লম্বা লাগবে। আর মুখ যদি হয় অতিরিক্ত লম্বা তাহলে ব্লাশ-অনের টান হবে চিক বোন থেকে কান পর্যন্ত। তাতে মুখটা দেখাবে গোল।

লিপস্টিকের শেডও জামার রং অনুযায়ী হওয়া চাই। তবে সকালের মেকআপে লিপ লাইনারের ভূমিকাই বড়। পাতলা ঠোঁট হলে লিপ লাইনারের রেখা ঠোঁটের সামান্য বাইরে দিয়ে টানুন। আর পুরু ঠোঁট হলে রেখা টানুন একটু ভেতর দিয়ে। সকালে লাইনারের রং গাঢ় হবে আর লিপস্টিক হবে হালকা স্কিন শেডের। পিঙ্ক বা বেজ গোছের।

মেকআপ করবেন পোশাক অনুযায়ী। ড্রেস ওয়েস্টার্ন হলে কপালে টিপ আঁকবেন না। সালোয়ার বা ঘাগরার সঙ্গে আঁকুন ডিজাইনার টিপ। চুলটা সব পোশাকের সঙ্গে খোলা রাখতে পারেন। গরম লাগলেও ভরপুর সাজের জন্য ওইটুকু সহ্য করুন।

৩৫-৫০ বছরের মহিলারা সাজে একটু সংযত হবেন। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং গয়না পরবেন। বিডসের হার আর কানে ম্যাচিং টপস। বেশি জাঙ্ক জুয়েলারির দিকে যাবেন না। সোনার গয়না যাঁদের পছন্দ তাঁরা পুজোর ক'দিন সকালে লম্বা চেন পরুন। এক্ষেত্রে কিন্তু কানে ঝোলা দুল চলতে পারে। আর হাতে ক'গাছা চুড়ি।

মেকআপের মধ্যে আইশ্যাডো আর লাইনার দিয়ে চোখ হাইলাইট করলেও ব্লাশ-অনটা বাদ দিন। লিপস্টিকের ক্ষেত্রেও লিপলাইনার আর লিপস্টিকের রং একই রকম রাখুন। আর চুলে বাঁধুন খোঁপা। ছোটো চুল হলে ব্যাককিপ লাগিয়ে রাখুন। যেটাই সাজুন খেয়াল রাখবেন সাজটা যেন চেয়ে না থাকে।

আমার চিত্রনাট্য লেখার অনুপ্রেরণা সত্যজিৎ রায় : পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

ছোটো ও বড়ো পর্দার জনপ্রিয় চিত্রনাট্যকার ও অভিনেতা **পদ্মনাভ দাশগুপ্তের** একান্ত সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : অভিনয় নাকি চিত্রনাট্য লেখা পছন্দের ক্ষেত্র কোনটি ?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : আমি আগে অভিনেতা, পরে চিত্রনাট্যকার হয়েছি। দুটো কাজই ভালো লাগে বলে ভারসাম্য বজায় রাখি।

প্রশ্ন : প্রথম অভিনয় কোন সিরিয়ালে ?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : ২০০২ সালে প্রথম অভিনয় করি বিউটিপার্লার-এ। পরিচালক ছিলেন সৌভিক চট্টোপাধ্যায়। আলফা বাংলায় চলত। এরপর কাজ করি মার্ডার ডট কম-এ।

প্রশ্ন : চিত্রনাট্য লেখার কাজে কীভাবে এলেন ?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : সৌমিক চট্টোপাধ্যায়ের অনন্যায় কাজ করছিলাম। সহঅভিনেতা ছিলেন খরাজ মুখার্জি ও অলকানন্দাদি। শট নেওয়া হবে অথচ তখনও চিত্রনাট্য এসে পৌঁছোয়নি। তখন পরিচালক আমাকে দুটো শট লিখে দিতে বলেন। অথচ এই কাজে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। পরিচালকের অনুরোধে দুটো শট লিখি। সবার পছন্দ হয়। এভাবেই আমার চিত্রনাট্য লেখার জগতে আসা।

প্রশ্ন : টেলিফিল্মের জন্য কবে চিত্রনাট্য লিখলেন ?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : বন্ধু রাজ চক্রবর্তী (রাজ তখনও সহ পরিচালক) এক টেলিফিল্মের জন্য আমাকে গল্প ও চিত্রনাট্য লিখতে বললেন। তাঁর অনুরোধে লিখি নদের চাঁদ। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন রুদ্রনীল ঘোষ। এরপর একে একে লিখি তিস্তা, এক ছুট, হাইওয়ে ১৯৯৮। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

প্রশ্ন : প্রথম কোন সিনেমার জন্য চিত্রনাট্য লেখেন ?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : নীল রাজার দেশ সিনেমার জন্য প্রথম চিত্রনাট্য লিখি। এই পর্যন্ত প্রায় ৬০-৭০টা সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছি। তার মধ্যে রয়েছে, লে ছক্কা, চ্যাপলিন, বাপি বাড়ি যা, প্রলয়, এবার শবর, ব্যোমকেশ পর্ব, দুর্গা সহায়, শ্রাবণের ধারা।

প্রশ্ন : কোন কোন সিনেমায় অভিনয় করেছেন ?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : সব সিনেমার নাম মনে পড়ছে না। তবে আবহমান, শত্রু, চ্যাপলিন, প্রলয়, নকশাল, পরিণীতা, মিতিন মাসি, মেঘে ঢাকা তারা, হানিমুন, শ্রাবণের ধারা।

প্রশ্ন : কমেডি চরিত্রে কাজ কি বেশি পছন্দের ?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : আমি কম কাজ করি তাই বেছে কাজ করি। চরিত্র ছোটো হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু দেখি সেখানে যেন অভিনয়ের সুযোগ থাকে।

প্রশ্ন : নানা ধরনের চরিত্রে কাজ করেছেন। কোন চরিত্রে অভিনয় করতে ভালো লেগেছে ?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : এক কথায় বলা শক্ত। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব ! এই মুহূর্তে আকাশ ৮

চ্যানেলে দেখানো সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে 'ঘেঁটে ঘ'-র কথা মনে পড়ছে। ওই সিরিয়ালে শঙ্করের চরিত্রে কাজ করে খুব খুশি হই। একটু অন্য ধরনের চরিত্র ছিল।

প্রশ্ন : চিত্রনাট্য লেখার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা কে জোগায়?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : অবশ্যই সত্যজিৎ রায়। ওঁর লেখা পড়ে চিত্রনাট্য লেখা শিখি। তিনিই প্রথম আমাদের শেখান সিনেমার আলাদা ভাষা রয়েছে, যেখানে কথা কম হবে।

প্রশ্ন : আপনি সত্যজিৎ রায়ের ভক্ত। তাঁর সৃষ্টির কোন চরিত্রে অভিনয় করতে পারলে খুশি হতেন?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : শাখাপ্রশাখা ছবির প্রশান্ত'র চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেলে খুশি হতাম। এছাড়া আরেকটি প্রিয় চরিত্র গুপী।

প্রশ্ন : একসময়ে বাংলা সিনেমা ছিল সংলাপ প্রধান। লোকের মুখে-মুখে জনপ্রিয় সংলাপ শোনা যেত। সেই প্রবণতা কি কমে এসেছে?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : এটা নির্ভর করে চরিত্রের ওপর। প্রতিবাদী চরিত্রের মুখে দর্শকরা চোখা চোখা সংলাপ পছন্দ করেন। আমার লেখা প্রলয় সিনেমার সংলাপ এক সময় খুব জনপ্রিয় হয়। এই সময়ের সিনেমার ভাষা, সংলাপ সবকিছু বদলে গেছে। সেদিকে নজর রেখে সংলাপ লিখি।

প্রশ্ন : বাংলা সিনেমা বাঁচাতে মূল ধারার ছবি কি বেশি হওয়া দরকার?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত : আগে বলা হত কমার্শিয়াল ও আর্ট ফিল্ম। এখন ওই বিভাজন উঠে গেছে। এখন বলা হয় ভালো ছবি ও খারাপ ছবি। বাংলা সিনেমা বাঁচানোর জন্য বাণিজ্যিক ছবি হওয়া দরকার। সিনেমা এমন এক শিল্প, যেখানে হাজার হাজার লোকের রুজি-রোজগার জড়িয়ে থাকে।

পুজোয় দেবের হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী

পুজোয় আসছে দেবের নতুন ছবি 'হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী'। ছবির পরিচালক অনিকেত চট্টোপাধ্যায়। দেবের সঙ্গে এর আগেও কাজ করেছেন অনিকেত। সম্প্রতি এই ছবির ট্রেলার রিলিজ হয়। 'ছানাদাদু' ওরফে প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে প্রযোজক দেব তাঁর নতুন ছবির ট্রেলার সামনে আনলেন। প্রসঙ্গত, 'সাঁঝবাতি' ছবিটি ছিল দেবের সঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষ কাজ। গল্পের সূত্র ধরে এই ছবিতে শোনা যাবে প্রয়াত অভিনেতার কণ্ঠস্বর। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কবীর সুমন। ছবিতে রাজা হবুচন্দ্রের ভূমিকায় রয়েছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী গবুর ভূমিকায় খরাজ মুখোপাধ্যায়, অন্যদিকে, রানি কুসুমকলির চরিত্রে রয়েছেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরদার ঝুলির গল্প 'সরকার মশাইয়ের থলে' অবলম্বনে ছবিটা তৈরি হয়েছে। যেখানে বোম্বাগড় রাজ্যের রাজা হবুচন্দ্র। প্রজারা তার রাজত্বে বেশ সুখেই থাকে। কিন্তু এই রাজ্যে ও রয়েছে সমস্যা। মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে নিয়ে রাজ্যের মানুষ খুশি নয়। তবে কী কারণে মন্ত্রীর ওপর প্রজারা ক্ষুব্ধ তা জানা যাবে ছবি মুক্তির পর। গত মে মাসে ছবি মুক্তির কথা ছিল। অতিমারির জন্য পিছিয়ে যায়। আগামী ১০ অক্টোবর দুর্গাপুজোয় ছবিটা মুক্তি পাচ্ছে। রূপকথার গল্প কতোটা দর্শকরা নেয় সেটাই এখন দেখার। এর আগেও টলিউডে রূপকথার কাহিনী নিয়ে ছবি হয়েছে।